লীলা মজুমদার

বেড়ালের বই

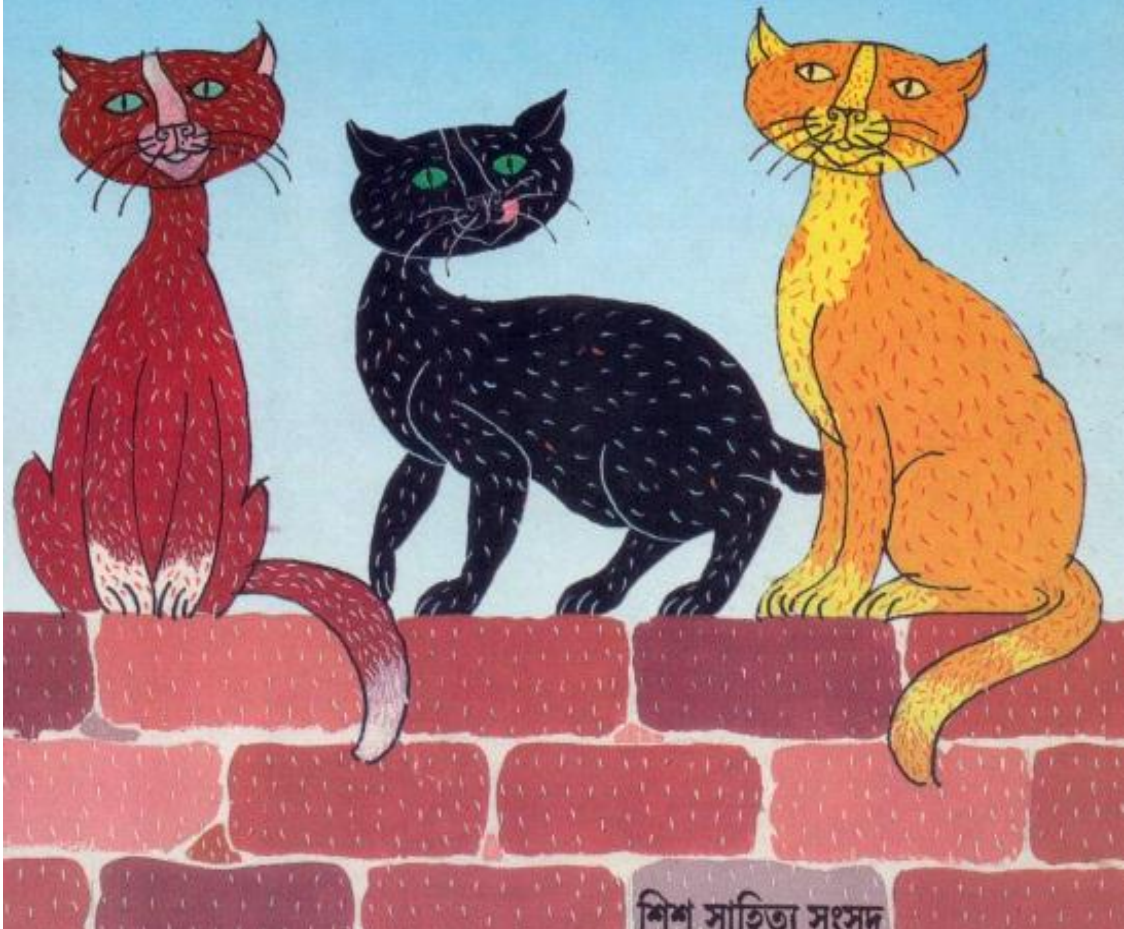

শিশু সাহিত্য সংসদ

উৎসর্গ

দুনিয়ার সব বেড়ালকে আর যারা বেড়াল পোষে, বা বেড়ালরা যাদের পোষে, তাদের এই বই দিলাম। কাউকে বাদ দিইনি।

ধলো বেড়াল কালো বেড়াল, বদ বেড়াল ভালো বেড়াল, গেছে বেড়াল মেছো বেড়াল, এদের বেড়াল তাদের বেড়াল, নাম জানি না কাদের বেড়াল — সবাইকে এ বই দিলাম।

ইতি

লীলা মজুমদার

এক বেড়াল বলে বেড়াল! দুনিয়ার কোনও দুই বেড়ালে সহজে মিল হয় না। যদি বা হয়, তার চাইতে না হওয়াই ছিল ভালো।

ওদের চোখের পলক ওপর থেকে নিচে পড়ে কি পড়ে না। অথচ চোখের মণির দু পাশ থেকে ঠিক যেন দরজার দুটি পাল্লা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। শান দেওয়া বাঁকা নখ থাকে থাবার খাপে গোঁজা নরম নরম গা আর গলায় মিউ মউ ডাক। তবু বলি সাবধান! আমার ছেলেবেলা কেটেছে পাহাড়ি শহরে। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন। নানা পাখি ডাকে, খ্যাঁকশেয়াল জানান দেয়। শোঁশোঁ বাতাস বয়, কুলকুল নদী ছোটে, ঝমঝম বাদল ঝরে। নদী ফুলে ফেঁপে ওঠে, পাগলা হাতির মতো ঝাঁপায়, মাটি কাঁপে।

পাহাড়ের ঢালে আমাদের বাড়ির টিনের চালে বড় বড় শালিখ নাচে। ধোঁয়া বেরবার চিমনিতে দাঁড়কাক বসে হেঁড়ে গলায় বলে, আ-আ! আ-আ!

বাগানে ফুলের বাহার। গাছে গাছে বিলিতি ফল ন্যাসপাতি, পিচ, এপ্রিকট, তুঁতফল। চাঁদানি রাতে বিশাল ডানা মেলে, বড় বড় বাদুড়রা আসে পাকা ফল খেতে! সকালবেলা

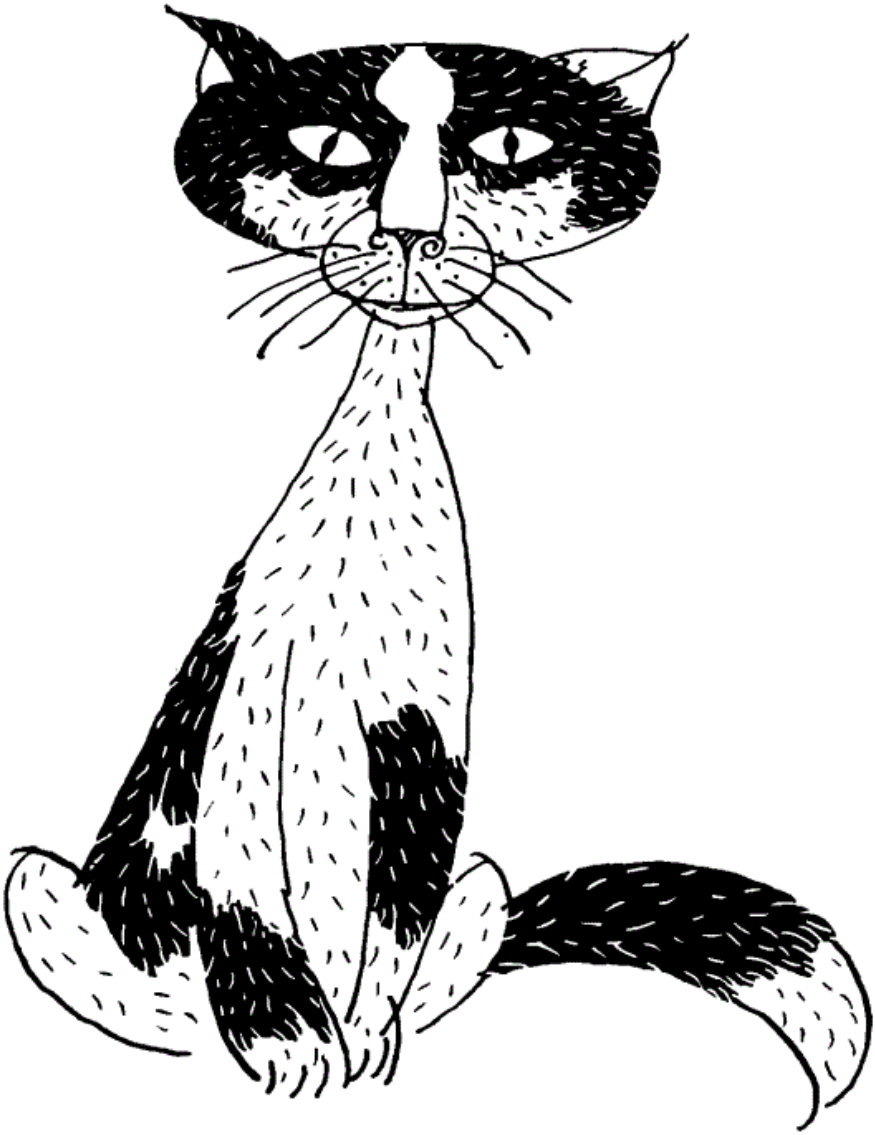

পাখির ডাকে কান ঝালাপালা। তারাও বাদুড়ে-আঁচড়ানো পাকা ফল খেতে আসে। সারা দিন তাদের পায়ের খুরথুর—তুরতুর শুনতে পাই। আমরা মুরগি পুষি, পায়রা পুষি। কালামাণিক বলে আমাদের ঘোড়া আছে। সে ছোলা খায়, গুড় খায়, করকচ নুন খায়।

এরা সব থাকে ঘরের বাইরে। আর অন্যদের বাড়ির ভিতরে যারা বাস করে, আমাদের বাড়িতে তারা ঠাঁই পায় না।

বড়রা বলেন, ছিঃ! ওরা বড় নোংরা। নোংরা কোথায়? পুঁটিদের কালো বেড়াল বদ-মেজাজি হতে পারে, তবে নোংরা নয়। আদর করতে গেলে, ফ্যাঁচ করে নখ বের করে, আঁচড়ে খুনোখুনি করে। তারপর আধা দিন ধরে, চেটে চেটে নিজের আগা-পাশ-তলা সাফ করে। যেখানটার নাগাল পায় না, থাবায় থুতু লাগিয়ে, সে জায়গাটাও ঘষে নেয়। মোটেই নোংরা নয়। তা কে শোনে?

এমনি করে বছর ঘুরে শীতকাল এল। কী শীত!! কী শীত! নদী-নালার ওপর রোজ সকালে বরফের সর পড়ে থাকে। রাতে শুতে গেলে মনে হয় বিছনা বুঝি ভিজে সপসপ

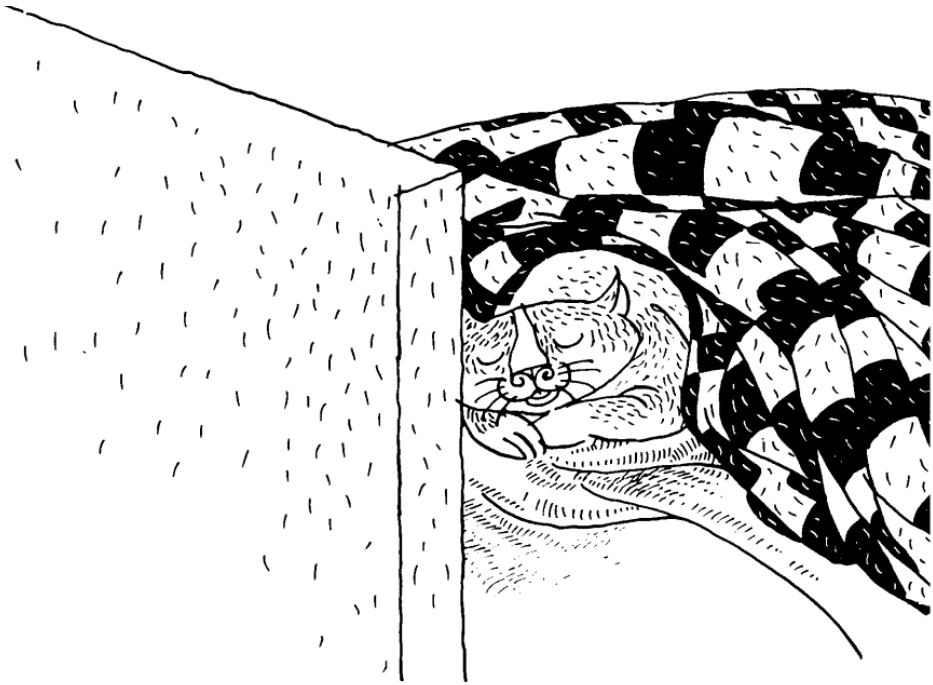

করছে! আমার পা দুটো হিম কিছুতেই গরম হয় না! দিদি আমার পাশে শোয়; তার পা গরম। তবু কিছুতেই ওর পায়ে আমার পা সেঁকতে দেয় না!

একদিন মনের দুঃখে যেই না পা সোজা করেছি, অমনি নরম গরম কীসে গিয়ে পা পড়ল! লেপ তুলে দেখি একটা এই বড় ছাই রঙের বেড়াল লেপের তলায় গুটিশুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে তার গায়ে পা রেখে সারা রাত আরামে ঘুমলাম। সকালে দেখি সে নেই, তবে জায়গাটা গরম।

এরপর থেকে ছাই বেড়াল রোজ আসত। আমি ছাড়া কেউ তাকে দেখেনি। সবাই বলতে লাগল-- বাহঃ ঘর থেকে সব নেংটি ইদুর হঠাৎ কোথায় পালাল? যাবে আবার কোথায়? শুধু আমি জানতাম হুলো তাদের দিয়ে জলখাবার করে। একটা লোম অবধি বাকি রাখে না। কী ভাবে আসত, কী ভাবে যেত, তা জানি না।

ঢালের ওপর বাড়ি। রাঁধবার ঘরটা আলাদা। একটু দূরে, একটু নিচে। সেখানে আমাদের ঢোকা মানা। সেটা যামিনীদার এলাকা। আমাদের ঠাকুমা তাকে দেশ থেকে পাঠিয়েছেন। আমাদের রাঁধাবাড়া করে। দেশের গল্প বলে। লাল চিনি দিয়ে দুধের চাঁচি খাওয়ায় আর কথায় কথায় আমাদের নামে আজেবাজে নালিশ করে বকুনি খাওয়ায়।

একদিন সে মাকে গিয়ে বলল, 'আমি যখন বড় বাজারে গেছি, তখন পোলাপানরা পাকঘরে গিয়া, ময়লা হাতে দুধের সর খাবলে খাইছে। সব দুধগুলান নাশ করছে!

শুনে আমরা হাঁ! মা বললেন, দরজায় তালা দাওনি?

তা দিছি? জানলায় জাল দেওয়া। ছোট জানলা বড়ই ছোট আর ছাদের সমান উঁচু। ওরা ঢুকল কী করে?

যামিনীদা মাথা চুলকে বলল, 'হ্যাঁ-তো আমি কইতাম পারতাম না। তবু কেউ খাইছে? এ-সব শুনে আমার একটু খটকা লাগলেও, কিছু বললাম না। হুলো আমার উপকারী! এর পর তার বাড় বড় বেশি বেড়ে গেল। সকালে মাছ কিনে এনে, কেটে কুটে ভেজে সেগুলো শিকেয় তুলে রেখে, যামিনীদা দুপুরে শুতে গেছে। বিকেলে রান্নাঘর খুলে দেখে শিকের দড়ি ছেড়া, শিকে ঝুলে আছে, নিচে মাছ ছড়াছড়ি, খিমচানো, খুবলানো!

সুখের বিষয় পেট পুরে মাছ খেয়ে, ঘরের কোণে হাত পা মেলে তুলো ঘুমচ্ছিল। সাড়া পেয়েই উঠে খোলা দরজা দিয়ে চোঁচাঁ!

যামিনীদা একটা চালা-কাঠ ছুড়ে মারল। অব্যর্থ টিপ। মিআঁও—বলে একটা বেঘো আওয়াজ করে, নিমেষের মধ্যে হুলো হাওয়া! আর সে রাতে আমাদের ঘরমুখো হয়নি। তত দিনে শীতও কমে গিয়েছিল, পা-ও জমে যেত না। তবু একটু মন কেমন করত।

পাশের বাড়ির কাউই সায়েবের বিলিতি বেড়ালের শখ ছিল। শুধু তাই নয়, তার ছয় জোড়া বিলিতি বেড়াল ছিল। তার এক জোড়ার ল্যাজ ছিল না। তাদের জাতের লাজ থাকে না। তারা একেকজন একেক বেলা ছোট এক টিন মাছ খেত। এক বাটি দুধ খেত। তারা গাছে চড়তে পারত না।

হুলো একবার এদুটোকে তাড়া করেছিল। শেষটা পালাবার পথ না পেয়ে বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমাদের বাড়িতে বেচারির হাজির হল। সোনালি গা, নীল চোখ!

পিছন পিছন গোঁপ ফুলিয়ে হুলোও হাজির! তখন তারা অন্য পথ না দেখে, খচমচ করে সামনের সরলগাছটার গা বেয়ে দশ হাত উঠে গেল! অথচ তারা কখনও গাছে চড়েনি। একটা ফ্যাকড়া ভালে পৌছে, তারা এ-ওকে আঁকড়ে ধরে, মিআঁও! মিআঁও ! ডাক ছাড়তে লাগল। কিছুতেই নামতে পারে না! হুলো ততক্ষণে ফ্যাচর-ফ্যাচর করে হাসতে হাসতে হাওয়া! শেষটা কাউই সায়েবের বেয়ারা এসে আমাদের মই লাগিয়ে, গাছে চড়ে, বেড়াল নামাল।

এরপর আর মোটে একবার হুলোকে দেখেছিলাম। মনে হয় আশেপাশেই হয়তো আমাদের গুদামঘরের খড়ের চালের খুপরি জায়গাতেই আরামে থাকত। ইঁদুরের অভাব ছিল না ওখানে ।

বাবার ঘোড়ার সহিস একদিন বিকেলে আমাদের ডেকে নিয়ে গেল। বলল – 'মজা দেখবে এসে।

গিয়ে দেখি পাশের বাড়ির বারোটা বেড়াল ওদের বাবুর্চিখানার বারান্দায় সারি সারি খেতে বসেছে। খানসামা একেকটা টিন খুলে একেকজনকে মাছ পরিবেশন করছে।

হঠাৎ একটা ঝলকের মতে কাঁটাঝোপের মাঝখান থেকে বেরিয়ে শাই করে হুলো পয়লা বেড়ালের পাতের মাছটি তুলে হাওয়া!

বেড়ালটা ক্যাঁও-ম্যাও করে উঠতেই খানসামা তার কাছে ছুটে এল আর সেই ফাঁকে

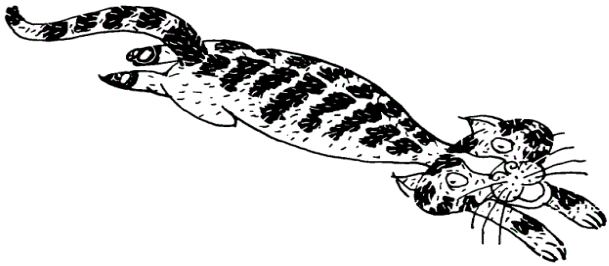

হুলে আবার সাই করে লাইনের শেষের বেড়ালের মাছটি তুলে, নিমেষের মধ্যে ঝোপের মাঝখানে মিলিয়ে গেল।

আমরাও খুঁজে দেখেছিলাম—পাইনি! এর কিছুদিন পরেই আমার বাবা বদলি হয়ে গেলেন। আমরাও শিলঙ থেকে চলে এলাম। আর হুলোকে দেখিনি। আমার মনে হয় সে তারপর যেখানেই থাকুক, নিজের আরামের সুবিধা করে নিয়েছিল। আহা, সে সুখে ছিল আশা করি।

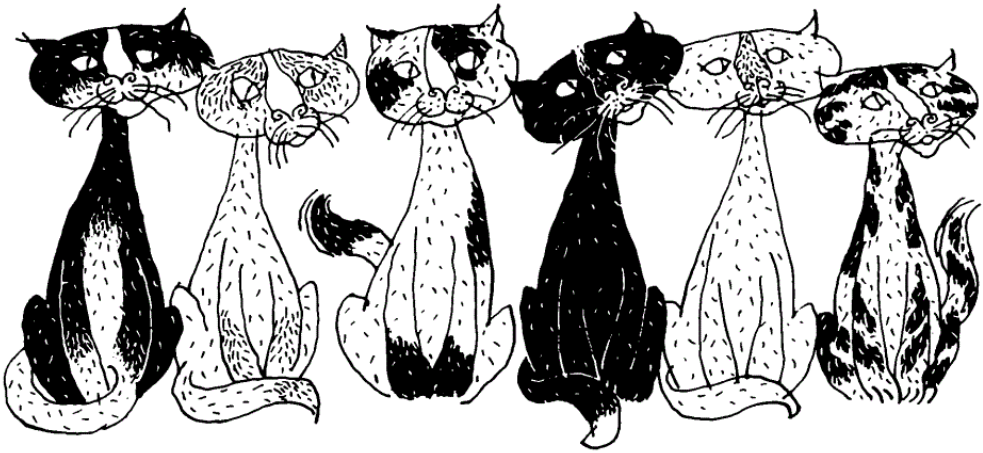

এর মাঝখানে আমার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। ছিলাম ছোট মেয়ে, হয়েছি আধবুড়ো, ছিলাম পাহাড়ে, থাকি কলকাতায়। গত কুড়ি বছরে বেড়ালদের খুব কাছাকাছি আসতে হয়নি। তবে দেখেছি, শুনেছি।

আমার শাশুড়ির ফুলি বলে একটা বেড়ালনী ছিল। সাদা সোনালি ডোরাকাটা, প্রায় কুকুরছানার সমান বড়। মাছ কুটতে কুটতে শাশুড়ি উঠে গেলে সে মাছ পাহারা দিত। কেউ কাছে এলেই দাঁত খিঁচুত। না গেলে নখ দেখাত। তবে অমন সাধু বেড়াল আমি দেখিনি। যাদের দেখেছি, তারা সবাই একটু ইয়ে। তাহলে খুলেই বলি। মন দিয়ে শোনো।

ততদিনে আমরা কলকাতার চৌরঙ্গিতে একটা পরনো চারতলা বাড়ির দোতালার খানিকটা ভাড়া নিয়ে থাকি। বাড়িটা খোলামেলা, চমৎকার। সামনে ঝোলানো বারান্দা পিছনে

খোলা ছাদ। সেখানে আমাদের দুটো বিলিতি কুকুর ঘুরে বেড়ায়। নালা দিয়ে এই বড় বড় মেঠো ইঁদুর উঠে এলেই, তাদের ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় মটকে ফেলে দেয়। আর ছোয় না।

আমাদের খোলা ছাদের ঠিক নিচেই একটা বড় দোকানের গুদাম। নানা রকম বিলিতি চিজ, শুকনো মাছ, নোনা মাংসে ভরা। গুদামটি হল নেংটি ইঁদুরদের স্বর্গ। তারা খুরথুর করে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে, নালা দিয়ে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে দোতালায় উঠে আসত। কুকুররা কিছু বলত না। তাদের সামনে বসে গোঁপ নাড়লেও না।

ইঁদুরদের সাহস বাড়ল। তারা আমাদের ঘরে ঢুকে কিলবিল করতে লাগল। দেখলেই আমরা তাড়িয়ে দিতাম। তবু বাড়িময় নেচে বেড়াত। কিছু খেত না। গুদামে থাকে তারা, খায়দায় সেখানে। শহরে ইঁদুর তারা; যা-তা মুখে রোচে না। এখানে আসত হাওয়া খেতে। আর ছানাপোনা পালবার নিরাপদ জায়গা খুঁজতে।

শেষটা আমার বুড়ি দিদি একদিন রেগেমেগে প্যাঁটরা গুছাতে বসলেন। এখানে তার টেকা দায়। তিনি কাশী চলে যাবেন। তা হলে কে আমাদের পায়েস-পিঠে-পুলি করে খাওয়াবে? কী আর করি, তাড়াতাড়ি মেজদির বাড়ি থেকে একটা মোটাসোটা, ছাই আর কালো ডোরাকাটা হুলো বেড়াল নিয়ে এলাম। পুরনো কথা মনে করে তার নামও রাখলাম হুলো। মেজদি বললেন, "হুলো নিবি? খাবেদাবে তোর ঘরে আর সারা দিন পাড়া বেড়াবে। ভাবলাম, সেই ভালো।

হুলো এসে বাড়ি থেকে কোথাও যাবার নাম করে না। কেন করবে? এখানে বাড়িময় ইঁদুর কিলবিল করে। দেখতে দেখতে বাড়ি ইদুর-শূন্য হয়ে গেল। বুড়ি দিদি মহাখুশি।

ঐ হল কলিকালের শুরু। জিমি-ব্রাউনির পাশে শুয়ে হুলে রোদ পোয়াত। আমরা বলতাম—আহা! ও বড় ভালো।

একদিন মাঝরাতে নিচের গলিতে সে কী মাও-ম্যাও ফ্যাঁশ-ফোঁশ খ্যাচর-ম্যাচর ইঁয়াও-ইঁয়াও! আমরা ওপর থেকে ঘটি ঘটি জল ঢালতে, তবে না সে থামল! পরদিন সকালে দেখি পুব দিকের পাঁচিলে হুলোর পাশে একটা কান-কামড়ানো কালো বেড়াল রোদে বসে আছে।

আমাদের দেখেই সে টুপ করে নেমে, কার্নিশ বেয়ে কোথায় চলে গেল। হুলেঅ তার সকালের দুধ-রুটির বাটির কাছে গিয়ে বলল ‘মিউ’।

পরদিন থেকে রোজ পাঁচিলে বসে হুলো আর কালোরোদ পোহায়। কেউ কাছে গেলেই কালো পালায়।

মাসখানেক বাদে আবার একদিন মাঝরাতে গলিতে ফ্যাঁচ-ঁফোচ ! ইঁয়াউ-ইঁয়াউ! আবার জল ঢালা হল। পর দিন পাঁচিলে হুলোর পাশে কালো, তার পাশে এক-চোখ-বোজা চকড়াবকড়া বেড়াল!

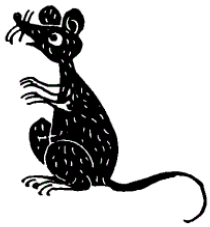

শেষ অবধি কারও বুঝতে বাকি রইল না যে হুলো একে একে পরখ করে নিয়ে, দল গড়ছে। বড়ই ভাবনা হল। কীসের জন্যে দল গড়ছে?

মাস গেল; বছর গেল; হুলোর দলে সব নিয়ে আটজন বাছাই করা সদস্য। তারা পাঁচিল থেকে নামে না। কার্নিশে চলাফেরা করে। মাঝেমাঝে দুদিনের মতো উধাও হয়। ফিরে এসে হুলো দু দিন খালি খায় আর ঘুমায়। যেন কত ভালো মানুষ। তবে বাড়িতে ইঁদুর নেই আর অন্য বেড়ালরা পাঁচিল থেকে নামে না।

এইভাবে বছরের পর বছর কেটে গেল। হুলোর চেহারায় কোনও বদল নেই। তবে গলিতে আর ফ্যাঁশ-ফোঁশ হয় না। দল বাড়েও না, কমেও না। তারা রোজ হাজিরা দেয়। হুলোর বয়স হয়েছে, অন্যেরাও কিছু কচি নয়। কোনও উৎপাত নেই। খালি মাঝে মাঝে হুলো কোথায় যেন চলে যেত।

সেবার দু দিন তার দেখা নেই। দলের বেড়ালরাও আসে না। আমাদের সে কী ভাবনা! ওরা ওকে মেরেটেরে ফেলে পালায়নি তো?

তৃতীয় দিনে কোনও রকমে কাটা ছেড়া শরীরটা টানতে টানতে পিছনের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে তহুলো হাজির! বাড়ির সবাই ছুটে এল, কেউ গরম জলে তুলো ডুবিয়ে মুছিয়ে দিল, কেউ গরম দুধ নিয়ে এল।

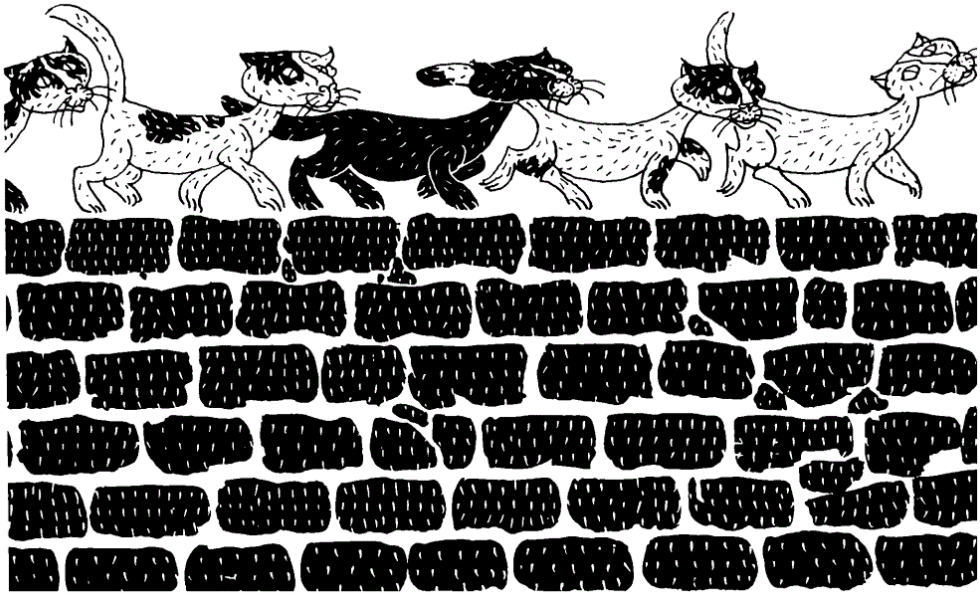

দুদিন খালি খাওয়া আর ঘুম। দলের বেড়ালরা সুখের সময় ভিড় করে; এখন তাদের দেখা নেই! হুলো সেরে উঠে আবার যেদিন ছাদের রোদে শুল, চেয়ে দেখি দলও এসে হাজির! হুলোর মুখটা দেখে মনে হল ওর হাসি পেয়েছে।

এইভাবে দিন কাটল! বছর কাটল। সকলের বয়স আরও বাড়ল একদিন দুপুরে আমি কোথাও বেরব। মনটা একটু খারাপ। হুলো সকালে দুধ পাউরুটি খায়নি। চুপ করে শুয়ে আছে। বড়ই বুড়ো হয়ে গেছে।

গাড়িতে উঠতে যাব, ড্রাইভার বলল, মা দেখুন!! চেয়ে দেখি পাঁচিলের উপর দিয়ে মাথা উঁচু লাজ খাড়া করা বেড়ালের সারি চলেছে যেন দেশ জয় করবে। সবার আগে হুলো! ড্রাইভার ওর একটা পা ধরে টেনে বলল, ওরে যাসনি। মরে যাবি? হুলো

খ্যাঁশ করে তাকে থাবার বাড়ি মেরে, এক লাফে পাশের বাড়ির গুদামের ছাদে; সেখান থেকে ওদের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায়। তারপর সেখানকার খুদে জানলা দিয়ে ভিতরে একের পর এক, সবাই। ঝনঝন করে বাসন ভাঙার আওয়াজ কানে এল। ড্রাইভার বলল, "মা তফাৎ দেওয়া ভালো!"

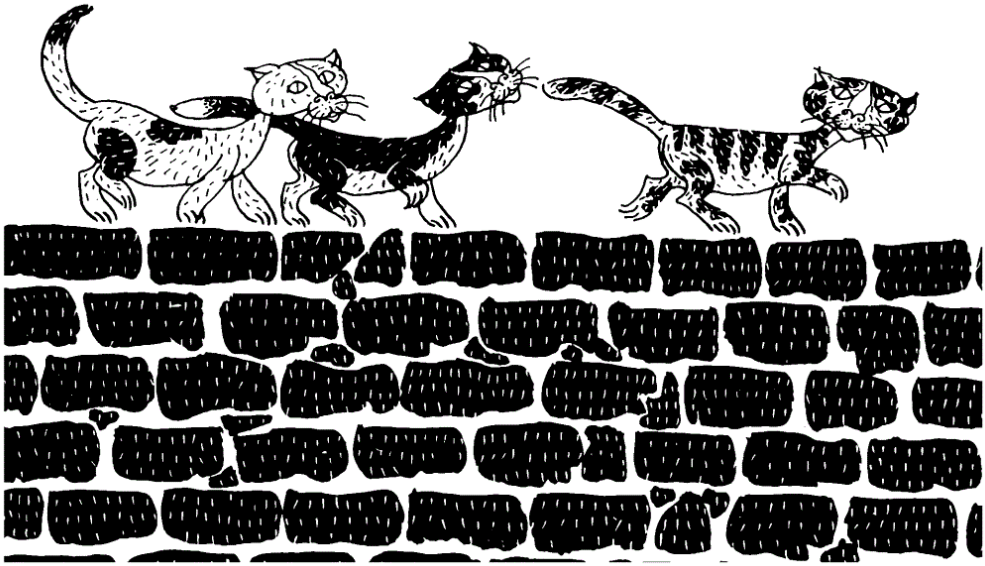

তিন

এবার বলি আমার বেড়ালের কথার শেষটুকু। কালে কালে বেলা গেছে। শিলঙের সেই খুদে আমি যে বিড়ালের গায়ে পা রেখে শীত তাড়াত, তারও চুলে পাক ধরেছে। চৌরঙ্গির বাড়ি ছেড়ে, আমরা শান্তিনিকেতনের বাড়িতে গিয়ে থাকি।

চার দিক খোলা মেলা। মাথার উপর কখনও নীল আকাশ, কখনও কালো মেঘ। তার তলা দিয়ে বকের সারি উড়ে যায়। বেনেবউ গান গায়। কাঠঠোকরা গাছ ঠোকরায়।

কাঠবেড়ালি শীতের পুঁজি জমাবে বলে ফুলের বিচি খুঁজে বেড়ায়। ছোট ছোট দল বেঁধে পাড়ার কুকুররা বাড়ি বাড়ি ঘোরে। কোনও উৎপাত করে না।

পাশের বাড়িতে এক কবি থাকেন। তাদের ফটক সদাই খোলা থাকে। কোনও পথের কুকুর না খেয়ে ফিরে যায় না। তা ছাড়া তাদের বাড়িতে ছিল গোটা সাত-আট রঙ-বেরঙের বেড়াল।ছোট বেড়াল, বড় বেড়াল, মা বেড়াল, বাবা বেড়াল, ছানা বেড়াল, দাদা বেড়াল, দিদি বেড়াল। সব চাইতে গলাবাজ বেড়াল ছিল ঐ দিদি বেড়াল। পাড়াময় তার ভাইবোন কিলবিল করে বেড়ায়। এর দুধ খায়, ওর মাছ খায়। বলে খায়, চরে খায়। আর বেচারি দিদি বেড়াল নাওয়া খাওয়া ভুলে,রোজ রাত পড়ার আগে, আঁতিপাঁতি ঢুঁড়ে,ভাইবোনগুলোকে জড়ো করে, ঘরে তোলে। তারপর নিজের খাওয়া শোওয়ার কথা ভাবে। আমরা থাকি কলকাতায়।

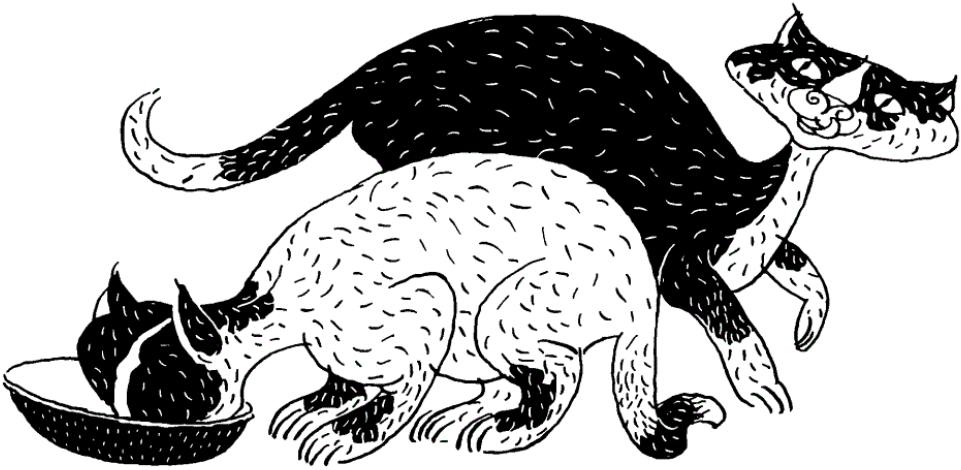

দুমাস বাদে আশ্রমে যাই। দিন বারো থেকে চলে আসি। কলকাতায় কাজ-কাম। তার বেশি থাকা হয় না। সেবার দু মাস পরে গিয়ে দেখি কবির বাড়ি ভোঁ ভোঁ করছে। দরজা জানলায় কপাট দেওয়া যেন গোটা বাড়ি চোখ বুজে রয়েছে।

রান্নাঘরের সামনে, গাছতলাতে মোড়া পেতে কত গল্প করেছি। এক সাথে কত খাওয়া-দাওয়া করেছি। কুকুর এসেছে, বেড়াল এসেছে, মাথার উপর পাখি উড়েছে, সেই বাড়ির এই দশা! মনটা হুহু করে উঠল।

কাছে পিঠের পড়শিরা বললেন, ওঁরা তলপি-তলপা নিয়ে চলে গেছেন ; কুকুররা আর আসে না। বেড়ালরা কোথায় কেউ জানে না। মনে ভাবলাম হয়তো সব বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। ভাবি সাত-আটটা বেড়াল কে-ই বা পুষবে? আছে বোধ হয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কী খায়, কোথায় ঘুমায়, কে জানে!

রাতে শুতে গিয়ে ভাবছি—ঐ দিদি বেড়ালের কী হল? তার যে দেবতার মতো স্বভাব

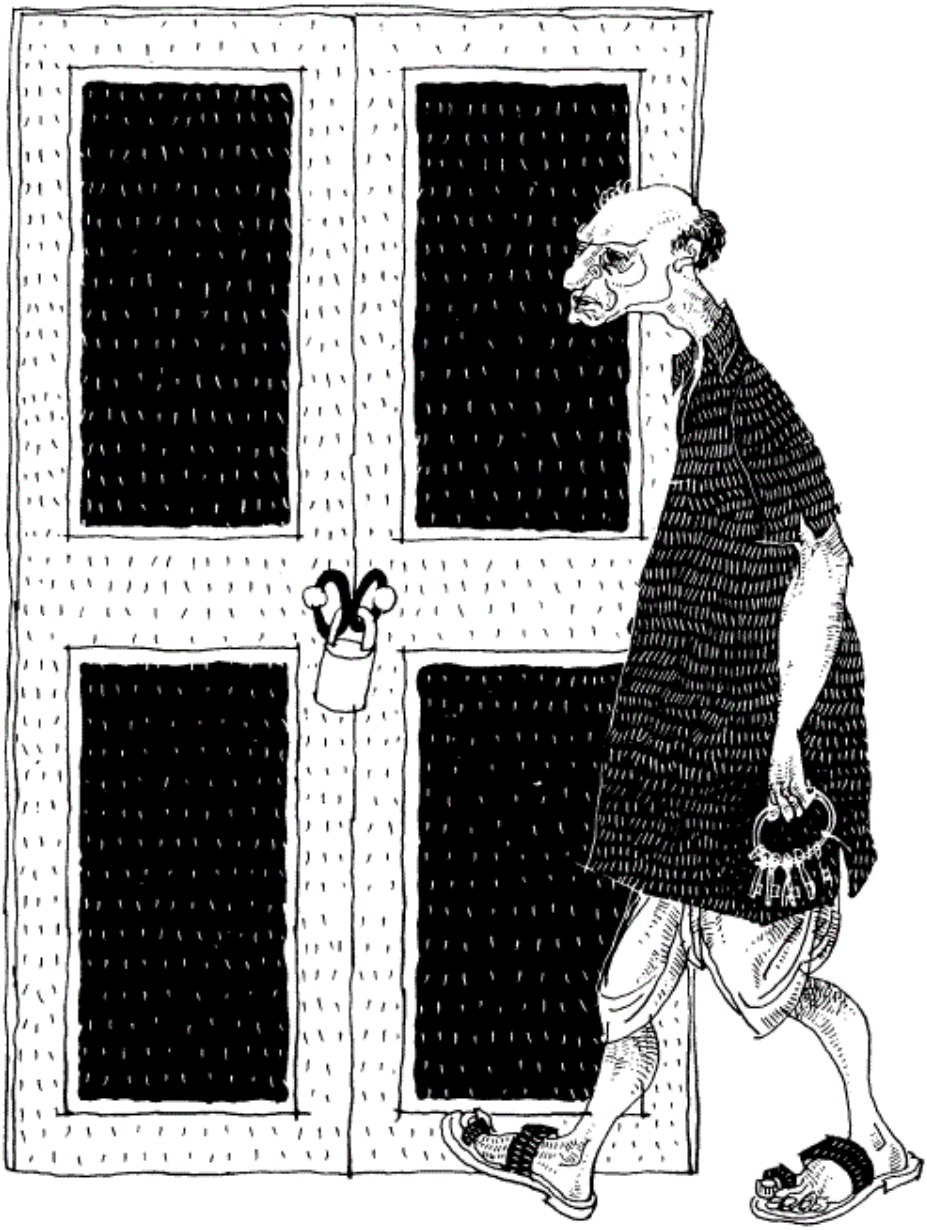

ছিল। দু বেলা সে যে তার উড়ন-চড়ে গোটা পাঁচেক ভাইবোনদের খুঁজে পেতে ঘরে না তুলে, মাছের কাটাকাটিও দাঁতে কাটত না! আহা, সে কোথায় গেল!

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি। মাঝ রাতে চমকে উঠে বসে পড়েছি ঐ দিদিবেড়ালের ডাক শুনছি যেন! ও ডাক যে আমার চেনা,কড়ির লোকদের ডেকে বলি, কী হবে? দিদি বেড়াল ঢুকবে কী করে? ঘরে যে তালা দেওয়া!

বাড়ির লোকের রেগে বলে, "মাঝ রাতে কী লাগিয়েছ। কই, আমরা তো শুনতে পাইনে! ঘুমের ঘোরে ঐ রকম ভাবছ। সারা রাত জেগে থেকে ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়লাম। ডাকটা তখন থেমে গেছে।

সারা সকাল ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করতে গেল। সারা দিন পাড়া-পড়শিদের খবর নিলাম। সবাই বললে, ‘কেউ নেই ও বাড়িতে। কতকগুলো ভাঙা তক্তাপোষ আর ছেঁড়া মোড়া ছাড়া কিছু নেই।'

তবে কি আমার মনের ভুল? সে রাতেও দিদি বেড়ালের কাতর ডাকে চোখের ঘুম ছুটে গেল। বাড়ির লোকদের কিছু না বলে, কবির বাড়ির ও পাশে পুচকি বলে মেয়ের কাছে গিয়ে বললাম, হ্যারে, খালি বাড়িতে রোজ রাতে বেড়াল ডাকে, সে আবার কেমন কথা?

পুচকি লাফিয়ে উঠল, ‘তুমিও শুনেছ তাহলে? আমার ছেলেরা বলে ঘুমের ঘোরে ভুল শুনি। একবার দেখা দরকার বাড়ির চাবি সুধাদাদার কাছে চিরকুট নিয়ে মালি গেল তার বাড়ি। রিকশা চেপে সুধাদাও অমনি এসে হাজির। মেজাজ সুবিধার নয়। পায়ে বাত, খুব দরকার না হলে চলাফেরা করেন না, হাতে চাবির গোছা।

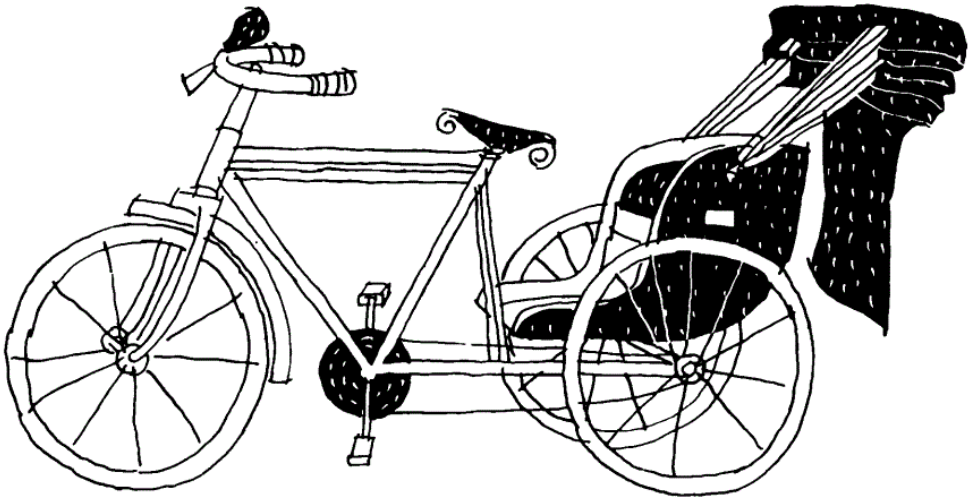

এসেই রেগে বললেন, “তোরা খেপেছিস?

তারা গেছেন চলে চার দিন হল। নিজে দেখে শুনে বারবাড়িতে, পাকশালেতে আলাদা তালা দিয়েছি। খালি ঘরে বেড়াল ডাকে, সে আবার কেমন কথা?

চাবির গোছা নিয়ে মালি আগে বারবাড়ির দক্ষিণের দোর খুলল। আমার ঘরে ঘরে ঢুকে দেখলাম কোথাও কেউ নেই। সব তকতক ঝকঝক করছে। ভাঙা আসবাবগুলোতে অবধি ধুলো নেই।

সুধাদা মহা খুশি! বললেন, মিছিমিছি কি আর বলছি, বাবা! নিজে সব সাফ-সুতরো করে তবে তালা দিইছি।’

আমরা বলালম, 'রোজ রাতে যে বেড়ালের ডাক শুনি, দাদা। তার কী হবে?

দাদা বললেন, সে ডাক তোদের মনে তোদের বেড়ালে পেয়েছে। হল তো? এবার ঘরে তালা দিয়ে আমি চলি?

পুচকে বলল, ‘চলি আবার কী? পাকশালটে দেখতে হবে না?

দাদা বললেন, "দেখবি আবার কী? ভোরের গাড়িতে গেছে তারা। চা অবধি খায়নি। রাতের খাওয়া পাঠিয়েছিলুম। চলি তবে।

পুচকে আকাশ থেকে পড়ল। ওমা, চলি আবার কী? পাকশাল দেখব।

বার বাড়ি আর পাকশালের মাঝখানে একটু ফাঁক। সেখানে ডালপালা মেলে চমৎকার এক শিশুগাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাকশালের দোরে একটা তালা ঝুলছে। মালি সেটি খুলে দিল।

সিকি মিনিট সব চুপ। সুধাদার গাল-ভরা হাসি।

তার পরেই বিকট ই—হি—আঁ—ও আওয়াজ দিয়ে, এক ঝলক আলোর মতো কী একটা ঘর থেকে বেরিয়ে, একেবারে দশ হাত দূরে, একটি বার মাটি ছুঁয়ে বিলকুল হাওয়া হয়ে

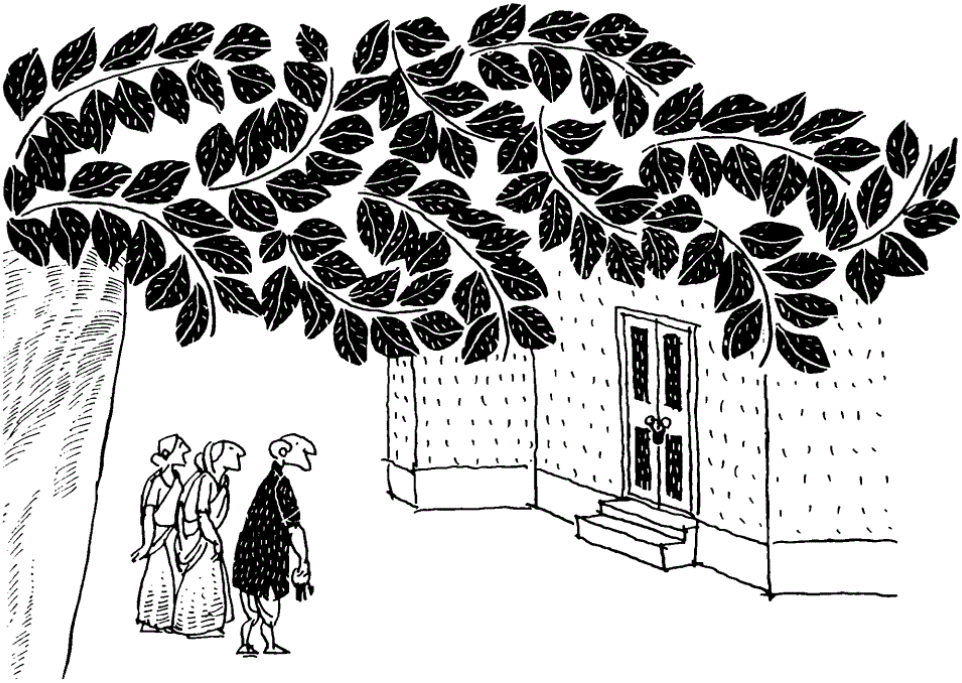

গেল। চিনলাম তাকে। সে দিদি বেড়াল। এ পাড়ায় কেউ আর তাকে চোখে দেখেনি।

সুধাদা তজ্জব বনে গিয়ে বললেন, 'নিজের চোখে দেখেশুনে তালা দিলাম আগের রাতে। তা সে ঢুকল কী করে?"

তখন আমার মনে পড়ল যে—"শুনেছিলাম ভাই বোনদের তাড়িয়ে এনে, খাইয়ে-দাইয়ে শুতে পাঠিয়ে, দিদি বেড়াল সবার শেষে যদি দেখত পাকশালে তালা পড়ে গেছে, তাহলে সে শিশুগাছ বেয়ে উঠে, পাকশালের ছাদের কাছের খুদে জানলা দিয়ে এক লাফে নিচে নামত। তার খাবার এক কোণে রাখা থাকত। খেয়ে দেয়ে ঐখানে সে ঘুমিয়ে থাকত। ভোরে পাকশালের তালা খোলা হলে, বেরিয়ে আসত।
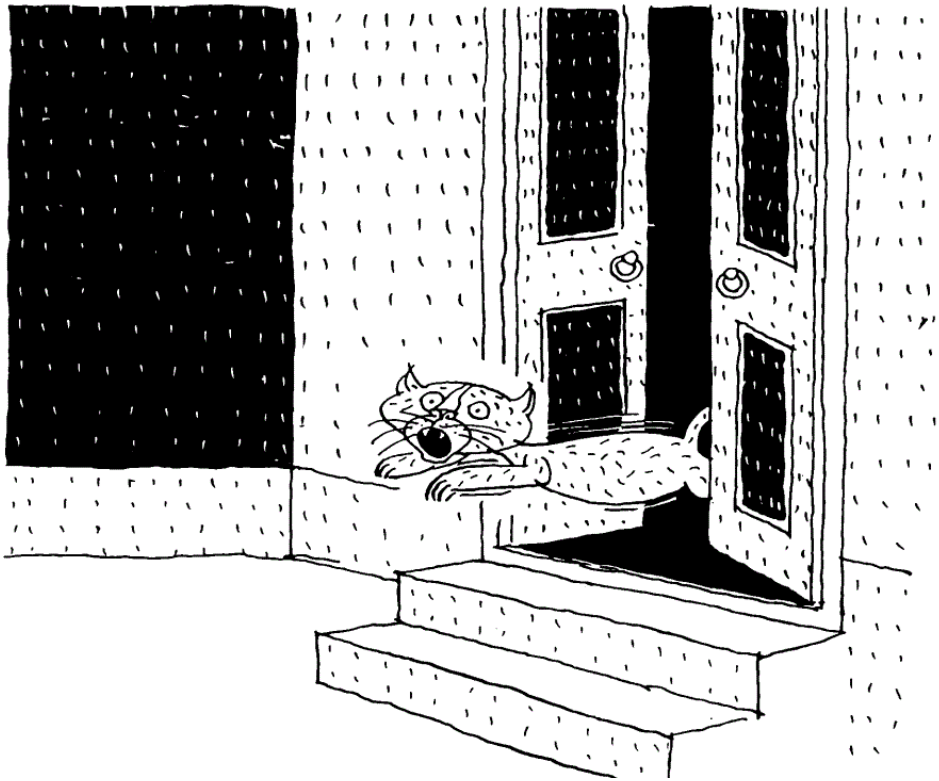
তার ভাই বোনদের বিলি করে তাকে ফেলে সবাই যে চলে যেতে পারে, এ কথা সে একবারও ভাবতে পারেনি! মানুষরা সব পারে।